ভোরের কাগজ ২১

তারিখ … 06 DEC 1998 …
পৃষ্ঠা … ৫ … কলাম … ৬ …

আশেপাশে

রাজধানীর বধির স্কুল

ছুটির ঘন্টা বাজতেই দলবেঁধে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। ঘন্টা না শুনলেও বুঝতে পারে এখন ছুটির সময় হয়েছে। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আঙুল নাড়িয়ে নাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা বলে ওরা। যে ভাষা বোঝার সাধ্য অনেকেরই নেই।

ওরা মূক এবং বধির। প্রকৃতির খেয়ালে ঘটে যাওয়া এক অসম্পূর্ণতার শিকার এসব ছেলেমেয়ে। ব্যক্তির আকৃতি, কাঠামো, পোশাকের ভিন্নতায় সে চিনতে পারে তার বাবা-মা অতি আপনজনদের। ঢাকার বিজয়নগরে বধিরদের জন্য গড়ে উঠেছে একটি স্কুল। প্রতিবন্ধী বহু শিশুর অত্যন্ত প্রিয় ক্ষেত্র। বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এখনো চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৬৩ সালে এ সংস্থা বয়স্ক বধিরদের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালে কাপড় বোনা, হাতের কাজের ছোটখাটো প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। ১৯৭৬ সালের ১ মার্চ প্রথম এখানে একটি স্কুল খোলা হয়। মাত্র সাতজন প্রতিবন্ধী শিশু নিয়ে নার্সারি ক্লাস আরম্ভ করা হয়। কিছুদনের মধ্যে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। সে বছরেই ছাত্রসংখ্যা বেড়ে ৩০-এ দাঁড়ায়। '৭৬ সালে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান মো. সিদ্দিকুর রহমান মজুমদার। আজো সেই হাল ধরে আছেন তিনি।

সিদিকুর রহমান জানান, সেই সময় শিক্ষদের তেমন কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না। নিজেদের চেষ্টায় বধিরদের পড়ানোর চেষ্টা করা হতো। ১৯৭৮ সালে জাতীয় বধির সংস্থা থেকে তাকে কলকাতায় প্রথম প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। ট্রেনিং শেষে আবার স্কুলে যোগ দেন তিনি। ব্যয়বহুল এই ট্রেনিং কোর্সটি অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে দেশে ফিরে তিনি নিজেই তার লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে অন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে আরম্ভ করেন। এভাবে দুই পর্যায়ে তিনি প্রশিক্ষণ দেন কয়েকজন শিক্ষককে। পরবর্তীসময়ে ১৯৮০ থেকে ৮৫ সাল পর্যন্ত সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর-এ বিষয়ে 'ইন সার্ভিস ট্রেনিং' ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ১৯৮৪ সালে স্কুলটিকে জুনিয়র হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৮ সালে সিদ্দিকুর রহমান লন্ডনে একটি ওয়ার্কশপে অংশ নেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সেখানে যেয়েই আমি দেখি মূকবধির প্রতিবন্ধীদের জন্য কতো প্রচেষ্টা তারা চালাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে আন্তরিক ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধা।'

অন্তত মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত এসব প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সে প্রসঙ্গে তিনি ব্যাপক অনুসন্ধান চালান বাইরের দেশগুলোতে। কিন্তু তিনি দেখেন বিদেশে এ ধরনের সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাইমারি পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনাকেই প্রাধান্য দেয়। পরবর্তীসময়ে মেধাবী ছেলেমেয়েরা ভর্তি হয় সাধারণ হাইস্কুলে। তাদেরকে মিশিয়ে দেওয়া হয় স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের মধ্যে। তবে এজন্য প্রচেষ্টা কম নেন না সেসব হাইস্কুল প্রধানরা। বিশেষ কোনো ক্লাসে বধির ছাত্রছাত্রীর জন্য রাখা হয় বিশেষ শিক্ষক। যিনি ক্লাসের মূল শিক্ষকের বিষয়গুলোই নির্দিষ্ট যোগাযোগের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন সেই প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীকে।

'আমাদের দেশে এরকম ব্যবস্থা গ্রহণে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা রয়েছে জেনেই আমি এই স্কুলটিকেই মাধ্যমিক পর্যন্ত বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি' — বললেন প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান।

তিনি বলেন, এদের মেধা, প্রচেষ্টা কোনো অংশেই কম না। বরং অনেকক্ষেত্রেই তা অনেক বেশি। কারণ এরা দেখছে পড়াশোনা করলে তাদের পরিবারের বোঝা হয়ে থাকতে হবে না। যেকোনো চাকরি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান, ভালো বিয়ে সব ধরনের সামাজিক সুবিধা তারাও পাবে। লেখাপড়াই তাদের এই আগ্রহকে ধরে রাখবার জন্য শিক্ষকদের আন্তরিকতা এবং একান্ত নিরলস চেষ্টা ছাড়া আর তেমন কিছু প্রয়োজন হয় না।

১৯৯০ সালে রেজিস্ট্রেশনের জন্য বোর্ডে যোগাযোগ করা হয়। তখন নবম শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা চালাচ্ছে এখানকার ছেলেমেয়েরা। '৯৩ সালে সাতজন পরীক্ষার্থী প্রথম এসএসসি পরীক্ষা দেয়। এদের মধ্যে একজন মাত্র পাস করতে পারে। কিন্তু সেটাকেই আশার আলো হিসেবে নেন স্কুলের শিক্ষকরা। পরের বছর শতকরা ৮৩ ভাগ ছেলেমেয়ে উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে আর ফিরে তাকাতে হয়নি স্কুলটিকে।

এক চিলতে মাঠের সামনে কয়েকটি ঘর নিয়ে চলছে স্কুলের কার্যক্রম। স্থান সংকুলান হয় না বলে পাশের আরেকটি বিল্ডিংয়ের তিন তলায় বিচ্ছিন্নভাবে চলে কয়েকটি ক্লাস। শিক্ষকসংখ্যা ১৪ জন। এছাড়া কারিগরি পাঠক্রমের সেলাই, কাঠের কাজ, নিটিং এবং আর্টের জন্য প্রয়োজন আরো চারজন শিক্ষক। এদের মধ্যে দুজন একসময় এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। এ ধরনের বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বেশি প্রয়োজন বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক। বর্তমানে ছয়জন এ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

বর্তমানে অনেকেই এ স্কুলের প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন বলে ছাত্র ভর্তির হারও বেড়েছে। কিন্তু সরকারিভাবে শুধুমাত্র শিক্ষক সুবিধা দেওয়া হলেও স্কুলের বিশাল ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে জাতীয় বধির সংস্থাকে— যা তাদের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনার জন্য লাইব্রেরি, কৃষি, বিজ্ঞান গবেষণাগারের প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে খেলার মাঠ, বিনোদনের ব্যবস্থারও। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এসব ব্যবস্থা একেবারেই অপ্রতুল বলে জানালেন শিক্ষকরা।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তৈরি কিছু কুটির শিল্পসামগ্রী নিয়ে একটি ছোট দোকান পরিচালিত হতো। যথাযথ বিপনন সম্ভব না হওয়ায় সেটিও এক সময় বন্ধ হয়ে যায়।

বধির স্কুলের শিক্ষার্থীরা

এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে ১৮৫ জন। দূর-দুরান্ত থেকে স্কুলে পড়তে আসে তারা। মিরপুর, ডেমরা, পাগলা, টঙ্গী বিভিন্ন এলাকার পড়ুয়ারা ভিড় জমায় এখানে। এদের যাতায়াতের জন্য স্কুলের পক্ষে কোনো পরিবহন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। একটি বাস থাকলেও অধিকাংশ সময় সেটি নষ্টই পড়ে থাকে। এছাড়া এসব ছেলেমেয়ের জন্য আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করলেন প্রধান শিক্ষক। এতে তারা নিজেদের মধ্যে এবং শিক্ষকদের সংস্পর্শে আরো বেশি উদ্যোগী ও কর্মক্ষম হয়ে উঠবে।

এক সময় সন্তানের এ জাতীয় দুর্বলতাকে আড়াল করতে চাইতেন বাবা-মা। সমাজকে গ্রাহ্য করতে গিয়ে অবহেলা করতেন সন্তানকে। বর্তমানে এ অবস্থা অনেকটা কেটে গেছে। বিত্তবান পরিবারের সন্তানরা যেমন এখানে পড়ছে তেমনি অসহায় দরিদ্র পিতামাতা ফ্রি স্কুলের সুযোগ নিয়ে প্রতিবন্ধী সন্তানকে দিতে চাইছেন আশার আলো। জাতীয় বধির সংস্থা সারা দেশে পরিচালনা করছে আটটি স্কুল। কিন্তু সম্পদের অপ্রতুলতার কাছে হার মেনে যাচ্ছে ইচ্ছা ও আশার স্বপ্ন। বধির স্কুলটির কার্যক্রম উন্নতির জন্য সকরকারি সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

□ রেহানা পারভীন রুমা